আইহোল

আতঙ্কের প্রথম অধ্যায়

মৈ মৈত্রেয়ী

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

পর্ব - ১

অতর্কিতে ঝড় এসে যখন সব লণ্ডভণ্ড করে দেয় তখন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে চওড়া নদীতে প্লাবন দেখা দেয়। দুই পাড়ের মাটির মিশেলে নদীর জল ঘোলা হয়ে যায় এবং তার গভীরে অধঃক্ষেপিত হয় দোলাচলে উড়ে আসা ছোটো-ছোটো নুড়ি-পাথর।

পনেরো দিনের সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতা, আমৃত্যু শিহরন জাগিয়ে তুলবে আমাদের। ওলট-পালট হয়ে যায় সহজ জীবনযাত্রা, গ্রাস করে আতঙ্ক; বিচিত্র এক অজানা পরিবেশের মধ্যে যুক্তি-তর্কের জলাঞ্জলি দিয়ে উদ্ভাবিত হয় একরাশ দুশ্চিন্তা। সেই ঘটনা লিখতে বসে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

২০১৪-র অক্টোবর, মহালয়ার পরের দিন নতুন ফ্ল্যাটে শিফ্‌ট করেছিলাম। এই ফ্ল্যাটটির গুরুত্ব আমাদের জীবনে অপরিসীম। অভিজ্ঞতাগুলো সবার সঙ্গে শেয়ার করব, এই ভাবনা যে মাথায় আসেনি তা নয়, কিন্তু বিষয়টা এত অদ্ভুত যে, তা করার জন্যও একটু বেশি রকমের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

শুরু করার আগে কিছু বিষয় জানিয়ে রাখা দরকার, নইলে ঘটনার ঘনঘটায় বিষয়গুলো জটিল হয়ে যেতে পারে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বটা সেরে নেওয়া যাক।

আমরা— আমি, অনিমেষ, দুই ছেলে (ডন- ল্যাব্রাডর, জো- খরগোশ) এক মেয়ে (বুবু- খরগোশ)।

বন্ধু পরিবার ১ (প্রবাসী বাঙালি)— অভিরূপ, সুচরিতা, এক মেয়ে (নোয়া- ল্যাব্রাডর)।

বন্ধু পরিবার ২ (অবাঙালি)— নাসির, অদ্রিজা, সাহ্নবি (৩ বছরের মেয়ে)।

এবার যেখানে থাকতাম তার বর্ণনা— উনিশতলা বিল্ডিং। প্রতি তলায় ছ'টা করে ফ্ল্যাট এবং দুটো লিফ্ট। লিফ্টের মাঝে দুটো ফ্ল্যাট এবং দুটো লিফ্টের দু'পাশে দুটো করে ফ্ল্যাট। প্যাসেজের একদিকে লিফ্ট এবং একদিকে সিঁড়ি।

১৫০১-১৫০৬ মুখোমুখি, এই ফ্ল্যাটের পাশে একটা খোলা জানালা। দুটো খোলা জানালার মাঝে উল্লিখিত সিঁড়ি।

১৫০২-১৫০৫ মুখোমুখি।

১৫০৩-১৫০৪ পাশাপাশি।

প্রতিটা ফ্ল্যাটের প্ল্যান প্রায় একই রকম। ফ্ল্যাটে ঢুকে বামদিকে বা ডানদিকে রান্নাঘর, তার শেষে ইউটিলিটি এরিয়া।

উল্লেখ্য— ১৫০২ আর ১৫০৩ এবং ১৫০৪ আর ১৫০৫-এর ইউটিলিটি এরিয়া গায়ে-গায়ে লাগানো।

***

ঘটনার সূত্রপাত—

ফ্ল্যাটে ঢোকার পর থেকে আমার একটা বদভ্যাস হয়েছিল। কেন জানি না, মনে হত বাইরের বিশাল প্যাসেজ থেকে আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে কেউ তাকিয়ে আছে। বারবার আইহোল দিয়ে দেখতাম। যদিও কাউকে দেখতে পেতাম না, তবুও দেখাটা কেমন যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছিল। অস্বাভাবিকতা বাড়ত রাত তিনটের পর থেকে। আধঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে চারবার না দেখলে যেন শান্তি পেতাম না। মাঝে-মাঝে এটাও মনে হত যে আমি হয়তো অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারের শিকার। অথচ বাইরে কিছুর আওয়াজ হলে বা অন্য ফ্ল্যাটের বেলের আওয়াজ পেলে কিন্তু বাইরেটা দেখার কথা মনেও হত না। এ যে কেমন অনুভূতি সেটা বলে বোঝানো খুব মুশকিল।

২০১৫-র লক্ষ্মীপুজোর আগের ঘটনা, অনিমেষের অফিস থেকে ফিরে বেল বাজানো আর দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ডনের দৌড়ে যাওয়াটা প্রতিদিনের মতো হল না। অনিমেষের দিকে গেলেও, হঠাৎ করে শক খাওয়ার মতো প্রায় ছিটকে দৌড়ে গেল ১৫০৬-র পাশের জানালাটার দিকে। এত গম্ভীর গলায়, রাগে চিৎকার করতে ডনকে কোনো দিন শুনিনি। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, গলার শিরা ফুলে উঠেছে। আমরা হতভম্ব হয়ে যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পরিস্থিতি

বুঝতে-না-বুঝতেই দেখি ডন, স্প্রিং টানার ভঙ্গিতে দু'পা পিছিয়ে জানালার দিকে ঝাঁপ মারার চেষ্টা করছে। অনিমেষ সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে ওকে চেপে ধরে ফেলল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে জানালাটা দেখা যাচ্ছিল না। তাই এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ডন তখনও চিৎকার করে চলেছে আর অনি প্রাণপণে ওকে জাপটে ধরে আছে। ওদের কাছে পৌঁছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। একটা গণেশমূর্তি প্যাসেজের দিকে মুখ করে জানালাটায় রাখা। সেদিন সকালেও টুকটাক কেনাকাটা করতে সুপারমার্কেটে গেছিলাম, কিন্তু অত বড়ো মূর্তিটা তখন ওখানে ছিল না। ডনের রাগ আর উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছিল, কোনো রকমে ওকে ধরে ঘরে নিয়ে আসা হল।

কত বড়ো ক্ষতি যে হত, সেটা ভেবেই শিউরে উঠেছিলাম। জানালাটা ছিল তুলনামূলক অনেকটাই নিচে, মোটামুটি আমাদের কোমরের উচ্চতায়। ডন যদি ঝাঁপাত, তাহলে গণেশমূর্তি সমেত সোজা উনিশতলার নিচে... আর ভাবতে পারছিলাম না! বাচ্চাটাকে বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম।

আমাদের একটা ধারণা হল যে, গণেশমূর্তিটা নিশ্চয়ই ১৫০৫-র। কারণ ওরা ছাড়া আমাদের ফ্লোরে আর কেউ মারাঠি ছিল না। ১৫০২ আর ১৫০৬-এর বাসিন্দারা মাঝে-মাঝে আসত ঠিকই, কিন্তু কোনোদিনই কাউকে থাকতে দেখিনি। ১৫০৩-এ এক বাঙালি পরিবার থাকে, কিন্তু

সেই সময় তারা কলকাতায়। আর ১৫০৫-এ যে নাসিরের পরিবার ছিল সেটা আগেই বলেছি, তবে ওদের সঙ্গেও বহুদিন দেখা হয়নি।

নাম শুনেই বোঝা যায় যে, নাসির মুসলমান। তবে ওর স্ত্রী অদ্রিজা ছিল রাজস্থানি ব্রাহ্মণ। ডনের সুবাদে ওদের ফ্ল্যাটে একবার গেছিলাম। ডন বরাবরই খুব মিশুকে বাচ্চা। একবার লিফ্‌টের মধ্যে ওদের সঙ্গে ডনের দেখা হয়েছিল। তারপর থেকে দরজা খোলা পেলেই ওদের দরজায় গিয়ে পা দিয়ে ধাক্কা মারত সে। ওদের গোটা পরিবারই পশুপ্রেমিক হওয়ায় ওরাও ডনকে খুব ভালবাসত। নাসিররা আমাদের মতোই ভাড়ায় থাকত। যদি ওদের বাড়িতেও মূর্তিটা থাকত, তাহলে অবশ্যই চোখে পড়ত। অন্যদিকে গত দু'-তিনদিন ধরে চোখে পড়েছে যে ১৫০৫-এর বাসিন্দারা ফ্ল্যাট থেকে তাদের মালপত্র বের করছে।

পরের দিন, অনিমেষ সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞেস করল যে, গণেশমূর্তির বিষয় তারা কিছু জানে কি না। তারা জানাল যে, এই ব্যাপারটা তারাও খেয়াল করেছে এবং আমাদের মতোই অবাক হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ডদের প্রায় সবাই-ই মারাঠি এবং বলাই বাহুল্য যে ওদের কাছেও বিষয়টা খুব আশ্চর্যের।

কিছুতেই যেন ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করতে পারলাম না। ভগবানের প্রতি সেইরকম ভাবে বিশ্বাস না

থাকলেও কোনোদিন তাঁকে অপমান করিনি। আমাদের বাড়িতে, মানে মুম্বইতে, কোনোদিন ভগবানের মূর্তি বা ফোটো ছিল না ঠিকই, কিন্তু মন্দির মসজিদ বা গির্জায় স্বেচ্ছায় যেতাম। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, সেই সময় আমি বেকার ছিলাম। এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকেই চাকরি নিয়ে বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম অদ্রিজাও নাকি চাকরি নিয়ে খুব বিপাকে পড়েছিল। অবশ্য এটা মেনে নেওয়া দোষের নয় যে অলস মস্তিষ্ক বলেই হয়তো গণেশমূর্তিটা নিয়ে একটু বেশিই ভাবছিলাম।

সেদিনই সন্ধেবেলা, বাইরে অনেকের গলার আওয়াজ পেয়ে, ১৫০৫-এর বাসিন্দাদের দেখার আশায় আইহোল দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, তারাই এসেছে। দরজা খুলে সোজাসুজি জানতে চাইলাম, "মূর্তিটা কি আপনাদের?"

পর্ব - ২

যা অনুমান করেছিলাম, ভদ্রলোক অতি বিনয়ী হয়ে একগাল হেসে হিন্দিতে বললেন, "হ্যাঁ।"

আমি ততোধিক রেগে কারণটা জানতে চাইলাম। উনি বললেন যে, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য যাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা নাকি ভুল করে মূর্তিটা ওইভাবে রেখে চলে গেছে। বাকি ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে যাওয়া বাকি

আছে। সেই জিনিসপত্র আর মূর্তিটা তারা আজকে নিয়ে যাবে। আমার রাগ কিন্তু কিছুতেই কমছিল না, বললাম, "দেখুন এইভাবে ঘরের ঠাকুর বাইরে রাখা আপনাদের মোটেই উচিত হয়নি। আজকেই নিয়ে যান, নইলে আমি সিকিউরিটি গার্ডদের দিয়ে বিসর্জন দিয়ে দেব।" বলে আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। ডন কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ করতে লাগল, যেটা ওর পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। আমাদের বাড়িতে যারা আসত বা আসে, তারা এসে প্রথমেই ডনকে আদর করা শুরু করে। বাচ্চাটা আসলে বড়োই আহ্লাদি। এখন অবশ্য তিনি বড়ো হয়েছেন, কিন্তু আদর খেতে এখনও একই রকম ভালবাসেন। ওই প্রথমবার কোনো মানুষকে দেখে, ডনকে রেগে যেতে দেখেছিলাম।

যা-ই হোক, ঘটনায় ফিরে আসা যাক। সকালে অফিস যাওয়ার তাড়া না থাকায় রাত জেগে গল্পের বই পড়তাম। রাত তখন সোয়া তিনটে হবে, যথারীতি দু'বার আইহোল দিয়ে দেখা হয়ে গেছে। ডন আবার ঠিক সেইভাবে ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। অনেক কষ্টে কোনোমতে ঠান্ডা করলাম। অনিমেষ তখন গভীর ঘুমে, এখন ওর পাশ দিয়ে দমকল চলে গেলেও ওর ঘুম ভাঙানো মুশকিল। আরও কিছুক্ষণ গল্পের বই পড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কী যেন একটা অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সবে সাড়ে সাতটা। অনিও তখন উঠি-উঠি করছে। খেয়াল করলাম আমার পাশবালিশের কভারটা পাশেই আছে, অথচ পাশবালিশটা নেই। ঘুমচোখে এদিক-ওদিক দেখলাম। বেডরুমের দরজা খুলে, আধো-ঘুমে জড়ানো চোখ নিয়ে সারা বাড়ি খুঁজে ফেললাম। ডন পাশবালিশ নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, তাই ভেবেছিলাম সে হয়তো বালিশটাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেছে; কিন্তু বেডরুমের দরজা যে এসি চলার জন্য সারারাত বন্ধ থাকে সেটা আর ঘুমের ঘোরে মাথায় আসেনি।

অনি বলল, "তুই শুয়ে পড়, আমি দেখছি।" সারা ঘরে পাশবালিশের খোঁজ পাওয়া গেল না। জো-বুবুদের খেতে দিয়ে, চা খেয়ে অনি অফিস চলে গেল। অনিমেষের পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে বাকি ঘুমটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আবার ডন আবার চিৎকার করে উঠল ঘরের একমাত্র জানালার দিকে তাকিয়ে। উফ্, সে কী ভয়ানক চিৎকার! সারা ঘর গমগম করে উঠল। ভাবলাম পাখি এসেছে বোধহয়, বললাম, "চল তো দেখি, তোর কোন শত্রু আছে জানালায়!" এই বলে দুটো পর্দা দু'দিকে সরিয়ে স্লাইডিং গ্লাসটা খুলতেই বুকটা ধক্ করে উঠল। গ্রিল আর স্লাইডিং কাচের মাঝে একদম ডানদিক ঘেঁষে আমার পাশবালিশটা সোজা করে দাঁড় করানো। বিশ্বাস হচ্ছিল না। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম